প্রাচীন 'কথা' ও আধুনিক ছোটগল্প ঃ কলাঙ্গিকগত একটি তুলনামূলক পাঠ

প্রসূণ ঘোষ

ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষেত্রভূমিতে— এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার নানা দেশে যে সমস্ত নীতিমূলক গল্প বিশেষত পশুপাখি জাতীয় গল্প প্রচলিত তার মূল উৎস পশ্চিমভূমি নয়, পূর্বভূমিই, বরং তা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে উপনীত হয়েছে— এমন অনুমান কেবলমাত্র ভারতীয় গবেষকরা নন, পশ্চিমী গবেষকরাও করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই নীতিমূলক ও পশুপাখি জাতীয় যে সমস্ত গল্প কাহিনিমূলক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র সর্বাধিক আদৃত হয়েছিল। পাশ্চাত্য গবেষকরা এই গ্রন্থকে বাইবেলের পরেই স্থান দিয়েছেন। আসলে পঞ্চতন্ত্র প্রথম কখন লেখা হয়েছিল, সে সম্পর্কে যথার্থভাবে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। গবেষক জোহানস হার্টেল পঞ্চতন্ত্রের আদিরূপে 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'-র কথা বলেছেন এবং অনুমান করেছেন, তেমনি খ্রিষ্টপূর্বকালে এ গ্রন্থ রচিত— একথাও স্বীকার করতে চাননি। বরং, ব্রাহ্মণ্য পূর্ববর্তীযুগে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে পঞ্চতন্ত্র রচিত হওয়াই সম্ভব এমন অনুমান করেছেন। কিন্তু যদিও পঞ্চতন্ত্রের গল্প ক্রমে ক্রমে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টপূর্ব ৬২০ থেকে ৬৫০ হয়ে থাকে, তাহলে একথা প্রমাণিত হয় যে পঞ্চতন্ত্র কেবল খ্রিষ্ট পূর্ববর্তী দশকে নির্মিত নয়, তারও পূর্ববতীকালে সৃষ্টি।

পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন বিষ্ণুশর্মা। দক্ষিণদেশের মহিলারোপ্য নগরে বাস করতেন অমরশক্তি নামে এক সহৃদয় রাজা। এই ঐশ্বর্যবান প্রজাবৎসল রাজার বসুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনেকশক্তি— তিন পুত্রই ছিল মুর্খ। পুত্রদের বেদনাভারাক্রান্ত রাজা শিক্ষার ভার দিলেন বিষ্ণুশর্মা নামক এক সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিতকে। অশীতিপর বৃদ্ধ বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর এ যাবৎ কাল অধিগত জ্ঞানকে পাঁচভাবে বিভক্ত করলেন এবং অত্যন্ত সরলভাবে তা প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন পাঁচটি বড় আখ্যান এবং সেই পাঁচটি বড় আখ্যানের সঙ্গে আরও ছোট - ছোট নানা আখ্যান সংযুক্ত করলেন। অর্থাৎ বিষ্ণুশর্মার ছাত্রদের উদ্দেশে জ্ঞানবিতরণমূলক গ্রন্থটিই পঞ্চতন্ত্র রূপে পরিচিত। গ্রন্থটি পাঁচভাগে বিভক্ত। এই পাঁচটি ভাগ বা তন্ত্র হল—মিত্র ভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক। মিত্রভেদে বিষ্ণুশর্মা শেখালেন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বিভাজনের কৌশলকে। অর্থাৎ এই বিদ্যা রাজনীতিবিদ্যারই সমতুল্য বলা যায়। মিত্রভেদে তিনি বন্ধুত্ব অর্জন করার উপায় শিক্ষায় দিলেন না, মিত্র প্রাপ্তিতে তিনি শেখালেন বন্ধুত্ব রক্ষা করার বিভিন্ন কৌশলকেও। কাকোলূকীয় হল দুই চিরশত্রুর কথা— অর্থাৎ কাক ও উলূক তথা পেঁচার কথা। অর্থাৎ এই তন্ত্রে বিষ্ণুশর্মা চিরশত্রুর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, চিরশত্রুকে দমনই বা কেমন করে করা যায়— সে বিদ্যা শিখিয়েছেন। পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ তন্ত্রের শিরোনাম লব্ধপ্রণাশ, যার অর্থ হল প্রাপ্ত ধন হারানো। অর্থাৎ এই তন্ত্রে ধন কীভাবে আয়ত্তে রাখা যায়, কী করলে এ ধন হারানো বা কোনভাবে খোওয়ানো যায় না—সে বিদ্যা দান করেছেন তিনি। পঞ্চতন্ত্রের শেষ তন্ত্র 'অপরীক্ষিত কারক' -এর অর্থ হল পরীক্ষা না করে অর্থাৎ ভাবনা - চিন্তা না করে কোন কিছু করা। এই নিহিতার্থ হল এই যে, কাজের উপরই ফল নির্ভর করে; সুতরাং সমস্ত কিছু বিবেচনা সহকারে করা প্রয়োজন। গল্পের মধ্যে দিয়ে এই বিদ্যাই শেখানো হয়েছে এই তন্ত্রটিতে।

অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' -এ বিষ্ণুশর্মা মূর্খ ছাত্রকে পণ্ডিত ছাত্রে পরিণত করতে চেয়েছেন নীতিজ্ঞান বিতরণের মধ্য দিয়ে। আবার সে ছাত্ররা যেহেতু চঞ্চল প্রকৃতির, তাই প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক বিষ্ণুশর্মা নীতিজ্ঞান বিতরণ করেননি, গল্পের আবরণের মধ্য দিয়ে তা করেছেন। আবার একই কারণে তিনি পশুপাখিদের চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং পশুপাখি চরিত্রগুলিকে তিমি মানবায়িত করেছেন। মানুষের মতো আচরণ তিনি তাদের করিয়েছেন, তাদের মুখে দিয়েছেন মানুষেরই সংলাপ তথা ভাষা। এইখানেই আধুনিক কালের ছোটগল্প যে ছোটগল্প বিশেষভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সৃষ্ট, সেই ছোটগল্পের সঙ্গে মানবেতর চরিত্রকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করা হয় না তা নয়, তাকে ঘিরে কাহিনিও আবর্তিত হতে দেখা যায়, কিন্তু মানবেতর চরিত্রের মুখে সচরাচর মানুষের ভাষা দেন না, ছোটগল্পকার, বরং সেই চরিত্র মানুষের মতো আচরণ করে—এমন চিত্র ঈঙ্গিতে উপস্থাপন করেন লেখক। অর্থাৎ অবাস্তব কল্পনার আতিশয্য সেখানে দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে রূপক কিংবা প্রতীকের মাধ্যমে মানবেতর প্রাণী কিংবা পশু - পাখি উপস্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রখর এক বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করার লক্ষ্যে। অর্থাৎ যে গল্পটিকে আশ্রয় করেন লেখক তার বাস্তবতা গুণটির হানি ঘটান। সব মিলিয়ে বলা যায়, কথা সাহিত্যের নবজাত শিল্পরূপ ছোটগল্পে একটি গল্প থাকেই, আধুনিক কালের ছোটগল্পের নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষা সত্ত্বেও, 'না - গল্প' কিংবা গল্প' -এর কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। আবার সেই ছোটগল্পের অবয়বে রূপক - প্রতীক - চিত্রকল্পের নানা কারুকর্ম সত্ত্বেও তার গল্পটি হয় বাস্তবসম্মত; অবশ্য সেই সঙ্গে এ সত্য স্বীকার করতেই হয় যে, সেই বাস্তবতার নানা মাত্রা থাকে, তারও থাকে নানা রকমফের। এখানে 'পঞ্চতন্ত্র' -এর মতো প্রাচীন ভারতীয় গল্পের সঙ্গে আধুনিক ছোটগল্পের মাত্রাগত মূল পার্থক্যটি সূচিত হয় অবশ্য 'পঞ্চতন্ত্র' -এর আখ্যায়িকাতে ছোটগল্পের বীজ যে ছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় ঃ

নগরীর এক ব্রাহ্মণ শ্রীনাথ ছিলেন পণ্ডিত, কিন্তু তিনি চুরিবিদ্যাতেও পারঙ্গম ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি তাই লোকে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন না। চারজন বিদেশী বণিকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হলে শ্রীনাথের পাণ্ডিত্যে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। বণিকেরা বিদেশ - বিভুঁইয়ে এসে রত্ন উপার্জন করে দস্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই রত্ন নিজ-নিজ উরুর চামড়া কেটে তার মধ্যে রেখে দিলেন। চুরিবিদ্যায় পাকা শ্রীনাথ সেই রত্ন কুক্ষিগত করতে চান বলেই বণিকদের সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং রণিকরাও তাতে সম্মতি প্রকাশ করলেন। গভীর অরণ্যের পথে কয়েকজন বাধ্য তাদের ধনরত্ন হরণ করতে সচেষ্ট হন এবং তাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিলেন। তখন বিদেশী বণিকেরা ভয়ে কেঁপে উঠলেনও শ্রীনাথ তাদের জানালেন যে তাদের কাছে কোন ধনরত্ন নেই, এমনকি তাদের শরীরের অভ্যন্তরেও ধনরত্ন কিছু নেই। সর্দার ব্যাধ শ্রীনাথের মুখে এই কথা শুনে তাকে টুকরো - টুকরো করে কেটে ফেলল এবং যখন ধনরত্ন কিছুই পেল না তখন অন্যদের ও ছেড়ে দিল। শ্রীনাথের মহত্বে বণিকেরা মুগ্ধ হলেন এবং কৃতজ্ঞতায় ও দুঃখে তাদের চোখে জল এল। এই রচনাটিতে একটি গল্প রয়েছে, আবার সেই গল্পটিতে এক লহমায় চোর শ্রীনাথ মহৎ শ্রীনাথে পরিণত হয়েছে, চরিত্রের এই বাঁক নেওয়ার ক্ষেত্রেও আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে এ গল্পের পার্থক্য লক্ষ করার মতো। আধুনিক ছোটগল্পে নিয়ত সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সংকট শীর্ষে উপনীত চরিত্রের বিবর্তন ঘটে— এক্ষেত্রে সে সঙ্কট তৈরি হয়নি। সর্বোপরি, এ গল্পের পরতে পরতে সেই নীতিবাক্য প্রবিষ্ট হয়েচে, তা হল মূর্খ বন্ধুর চেয়ে পণ্ডিত বন্ধু শ্রেয়, তা সে চোর কিংবা অন্য বদ কোন দোষে দুষ্ট হলেও, যা আধুনিক ছোটগল্পে লক্ষিত হয় না।

পঞ্চতন্ত্রের 'লব্ধ প্রণাশ' তন্ত্রের একটি রচনায় বলা হয়েছে যুধিষ্ঠিরের কথা। যুধিষ্ঠির হাঁড়ি - কলসি, মালসা - থালা ইত্যাদি তৈরি

করত। একদিন হাটে নিজের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করতে গেলে রাত্রি হয়ে যায়। রাতে বাড়ি ফেরা পথে কুকুরে তাকে তাড়া করে এবং সে পড়ে গিয়ে আহত হয়। পরে কপালের ক্ষতস্থান ভাল হলেও সেখানে থেকে যায় ক্ষতচিহ্নের দাগ। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যুধিষ্ঠির নিজ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং এক নতুন দেশে রাজার দরবারে কাজের জন্য উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠিরকে দেখে রাজ ছদ্মবেশী রাজপুত্র বলে মনে করলেন এবং তাকে সেনাপতির পদে বহাল করলেন। বিত্তবান যুধিষ্ঠির সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। শত্রু এসে রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা যখন যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হলেন এবং তাকে সে যুদ্ধের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন তখন সে যে কোনদিন যুদ্ধ করেনি একথা জানাল। তখন রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। 'পঞ্চতন্ত্র' -এর এই রচনাটিতেও একটি গল্প রয়েছে, আবার এ গল্প বাস্তবসম্মতও বটে। কিন্তু ছোটগল্পের চরিত্র হয় আধুনিক উপযোগী জটিল চরিত্র, কিন্তু এই গল্পটির চরিত্ররা আধুনিক যুগোপযোগী জটিল নয়। উপরন্তু এ গল্প যে বর্ণবিভাজিত সমাজের রক্ষকদের বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট তাও উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং গল্পের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নীতিবাক্যটিকেও তাই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উপরন্তু গল্পটির ঘটনাধারার মধ্যে সঙ্কট মুহূর্তও তৈরি হয়নি, অথচ যুধিষ্টির চরিত্রের আত্মপরিচয়কে কেন্দ্র করে সেই সঙ্কট তৈরির যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

পঞ্চতন্ত্রের শেষ তন্ত্র ' অপরীক্ষিত কারক' অংশে আছে লব্ধবিদ্য, কৃতবিদ্য, অশেষবিদ্য ও সুবুদ্ধি —এই চার বন্ধুর কাহিনি। প্রথম তিন বন্ধু নানা বিদ্যা শিখে পণ্ডিত হয়েছিল আর সুবুদ্ধি পুঁথিগত বিদ্যা না শিখলেও জন্মার্জিত বুদ্ধির অধিকারী ছিল। চার বন্ধু অর্থ আহরণের জন্য বিদেশ যাত্রা করলে লব্ধবিদ্য ও কৃতবিদ্য বিদ্যাহীন বলে সুবুদ্ধিকে ত্যাগ করতে চাইল, কিন্তু শেষপর্যন্ত অশেষবিদ্যের অনুরোধে সে থেকে গেল। পথে যেতে যেতে গভীর এক অরণ্যের মধ্যে কিছু পড়ে থাকতে দেখে তার বন্ধুরা মিলে নিজেদের অধীত বিদ্যাকে পরীক্ষা করতে চাইল। লব্ধবিদ্য তার শিক্ষা দিয়ে সেই অস্থিগুলিকে জোড়া লাগাল, কৃতবিদ্য তার অধীত বিদ্যার সাহায্যে তাতে রক্ত মাংসের সঞ্চার করল এবং তাতে ত্বক-চোখ - নাক ও কেশর যোগ করল। ফলত তা এক মৃত সিংহের আদল নিল। অশেষবিদ্য সেই মৃত সিংহের প্রাণ সঞ্চারে উদ্যোগী হলে সুবুদ্ধি বারংবার বাধা দিল। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে সে তার বিদ্যা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হল। তখন সুবুদ্ধি বাধ্য হয়ে একটি গাছে উঠে আশ্রয় নিল। অশেষবিদ্য সেই মৃত সিংহের দেহে প্রাণ সঞ্চার করলে জীবন্ত সিংহ তর্জন ক'রে তিন বন্ধুকেই খেয়ে ফেলল। সুবুদ্ধি গাছের ডালে বসে তার বন্ধুদের দুর্দশা দেখল। পঞ্চতন্ত্রের এই রচনাটিতেও গল্প রয়েছে, কিন্তু এ গল্প আধুনিক ছোটগল্পের মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে এ গল্পে রয়েছে অলৌকিকতার আতিশয্য আর গল্পগুলির কাহিনিতে অলৌকিকতার নানা দিক থাকার ফলে তাতে বাস্তবতার হানি ঘটেছে। আবার গল্পগুলিতে ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারও রয়েছে। তাই দেখি, পশুপাখি চরিত্রগুলি যা ভাবে বা চিন্তা করে, পরবর্তীকালে সেই চিন্তার প্রয়োগও সফলভাবেই ঘটে। এই ইচ্ছাপূরণ আধুনিক ছোটগল্পের কাহিনি ধারায় থাকে না। ফলত ঘটনাগত কিংবা চরিত্রের মনোভঙ্গিগত সঙ্কটও পঞ্চতন্ত্রের রচনায় তেমন নেই। এই রচনাটিতেও তিন বন্ধুর অধীত বিদ্যার সফল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আবার সুবুদ্ধি যে উপদেশ দেয় তার অপরাপর বন্দুদের, তারা তা শোনে না, কিন্তু তার উপদেশও অক্ষরে অক্ষরে ফলে। এই ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটি গল্পে সঙ্কট মুহূর্ত সৃষ্টির দিকটিকে লঘু ক'রে দেয়। এখানেই এই কারণেই বলা যায়, পঞ্চতন্ত্রের রচনায় ছোটগল্পের বীজ থাকলেও উভয় রচনার স্বরূপগত পার্থক্যকে অস্বীকার করা যায় না।

আসলে, পঞ্চতন্ত্রের মতো রচনায় পশুপাখিকে মানবায়িত করার মধ্য দিয়ে সেকালের কবিদের লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলেও এই চরিত্রগুলি হয় টাইপধর্মী। তাছাড়া এ জাতীয় রচনায় নীতিকথাকে প্রচার করা হয় বলে এবং লোকশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই রচনাগুলি সৃষ্ট হয়েছে বলে এক্ষেত্রে ভালর জয় এবং মন্দের পরাজয় সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়। রূপকের আবরণে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে গল্পগুলি উপস্থাপিত হলেও আধুনিক যুগ জটিলতা গল্পগুলিকে স্পর্শ করেনি।

পঞ্চতন্ত্রের প্রভাবে পশুপাখিকে মানবায়িত করে রচিত হয়েছে হিতোপদেশ। আসলে, পঞ্চতন্ত্রের নানা রূপ প্রচলিত ছিল—দক্ষিণ প্রদেশে, কাশ্মীরে কিংবা নেপালে। পঞ্চতন্ত্রের কোন লুপ্তপ্রায় অংশকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ। গবেষক কীথ হিতোপদেশ সংকলয়িতা নারায়ণকে বাঙালি বলে মনে করেছেন এবং হিতোপদেশের রচনাকালকে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। হিতোপদেশে কৌরী উপাসনা তন্ত্রসাধনার উল্লেখ আছে, যা পঞ্চতন্ত্রে নেই— তা একান্তই বাংলাদেশে প্রচলিত, সুতরাং হিতোপদেশের রচনাকার বাঙালি— কীথের এ অনুমান সম্পূর্ণ অভ্রান্ত— একথা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন পঞ্চতন্ত্রে কোন বিশেষ দেবী উপাসনার কথা থাকলেও অন্য পঞ্চতন্ত্রে নেই, আবার এ সত্য হিতোপদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে, হিতোপদেশের প্রারম্ভেই রয়েছে এ গ্রন্থের উৎপত্তির বিবরণ, সেখানে রয়েছে রাজা সুদর্শনের কথা, যে সুদর্শন ভাগীরথী তীরের সমৃদ্ধ নগর পাটলিপুত্রের রাজা সুতরাং, এ অনুমান করা যায় যে, হিতোপদেশ পূর্বভারতে রচিত এবং সংকলক নারায়ণ পূর্বভারতের অধিবাসী ছিলেন।

পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে হিতোপদেশের রয়েছে ছত্রে ছত্রে সাদৃশ্য। পঞ্চতন্ত্রে ছিল অমরশক্তির তিনপুত্র, এখানে দেখা যায় সুদর্শনের তিনপুত্র। অমরশক্তির মতো সুদর্শনেরও এই পুত্ররা ছিল নির্বোধ। রাজ একা শুনলেন একটি শ্লোক, যার অর্থ হলঃ বিদ্যা চোখের মতো, বিদ্যাহীন তাই চক্ষুহীন অর্থাৎ অন্ধের মতো। বল, ধনসম্পদ, নির্বুদ্ধিতা –এগুলির যে কোনটিই বিপদের কারণ। এ সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে বিনাশ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। একথা শুনে উদ্বিগ্ন রাজা তার দরবারে পণ্ডিত সমাবেশ করে উচ্ছৃঙ্খল পুত্রদের শিক্ষা দেওয়ার কথা বললেন। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের শিক্ষা দেওয়ার ভার নিলেন। লক্ষণীয় পঞ্চতন্ত্রেও রাজপুত্রদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যিনি তাঁর নামও বিষ্ণুশর্মা। পঞ্চতন্ত্রেও রচনাগুলি ছিল চারটি অংশে বিভক্ত হিতোপদেশের রচনাগুলিও কাহিনিধর্মী, কিন্তু সম্পূর্ণত গল্পে লেখা নয়, ছন্দোবদ্ধ কবিতার সাহায্যে লেখা। মিত্রভেদের গল্পে আছে সংসারে বন্ধুলাভের কাহিনি, সুহৃদভেদে আছে বন্দুবিচ্ছেদের কাহিনি— এই দুই অধ্যায় শিরোনাম যেমন পঞ্চতন্ত্রে সদৃশ তেমনি এর গল্পগুলির বিষয়বস্তুও প্রায় সম ধরনের। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম দুই অধ্যায়ের সঙ্গে সদৃশ তেমনি এর গল্পগুলির বিষয়বস্তুও প্রায় সম ধরনের। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলিকেই যেন নতুন করে পরিবেশন করা হয়েছে। বিগ্রহ অধ্যায়ের যুদ্ধের নিয়মনীতি ও কৌশল সম্পর্কে শেখানো হয়েছে আর সন্ধি অধ্যায়ে দুই প্রতিস্পর্ধী শত্রু মিত্রতার কৌশল সম্পর্কে অর্থাৎ সন্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অনেক বেশি স্বতস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট। কিন্তু হিতোপদেশের রচনাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পঞ্চতন্ত্রের কাহিনি থেকে নেওয়া, কিছু ক্ষেত্রে জাতক কাহিনি থেকে নেওয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে সমকালের ঘটা কোন কাহিনি থেকে নেওয়া। ফলে, সে কাহিনি কখনো যেন সংক্ষেপিত, কখনো তা পৃথুল। আবার পঞ্চতন্ত্রের গল্প বলার ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটি যেখানে প্রচ্ছন্নে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, রূপক ভেদ ক'রে লোকশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যটি অতীব স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং, গল্পের শিল্পমূল্য নয়, নীতি বিতরণই হিতোপদেশের মুখ্য লক্ষ্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শৈবযোগীরা তৎকালে সর্ববোধ্য প্রাকৃত ভাষায় একটি বড় গল্পজাতীয় রচনা সংকলন করেছিলেন। প্রাকৃতভাষায় এরপ নাম 'বড্ড কহা'। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থটিকে 'বৃহৎ কথা' বলা হয়েছে এবং সংকলকের নাম বলা হয়েছে গুণাঢ্য। এর গল্পগুলি পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে আনুমানিক নবম - দশম শতাব্দীতে এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়। যেমন ক্ষেমেন্দ্র 'বৃহৎ কথা

মঞ্জরী', 'কথা সরিৎ সাগর' এবং বুদ্ধস্বামী 'বৃহৎ কথা শ্লোক সংগ্রহ' নামে এই গ্রন্থটি অনুবাদ করলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিকরা গুণাঢ্যের সংকলনগ্রন্থ থেকেই গল্পবীজ পেয়েছিলেন— এমন অনুমান করা হয়।

কথাসরিৎ সাগরের সূচনা হয়েছে প্রথমে নীলকণ্ঠ শিবের, পরে গণেশের এবং সবশেষে সরস্বতীর বন্দনার দ্বারা। এর কথারম্ভে রয়েছে শিব ও পার্বতীর কথা। কৈলাসে শিব পার্বতীর উপাসনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে খুশি করতে চাইলেন। পার্বতী তাঁর প্রভুর কাছে অভিনব গল্প শোনার বাসনা প্রকাশ করলেন। শিব নন্দীকে দরজায় পাহারার জন্য নিযুক্ত ক'রে নিভৃত কক্ষে গল্প বলা শুরু করলেন। কৌতূহলী পুষ্পদন্ত যোগ বলে অদৃশ্য হয়ে পার্বতীর কাছে শিবের বলা গল্পটি শুনে নিলেন। পুষ্পদন্ত তাঁর স্ত্রী জয়াকে সেই গল্পটি অবিকলভাবে বললেন। জয়া আবার সেই গল্পটিই শোনালেন পার্বতীকে। পার্বতী তাঁর স্বামীর কাছে কোন অভিনব গল্প শোনেননি, সে গল্প সকলেরই শোনা, এমনকি জয়াও সে গল্প জানে, সে-ও শুনিয়েছে তাঁকে ঐ একই গল্প—এ নিয়ে যখন স্বামী শিবকে অভিযোগ জানালেন— তখন ধ্যানস্থ শিব প্রকৃত সত্যটি অনুধাবন করলেন। এবার পার্বতী চরম ক্রুদ্ধ হয়ে পুষ্পদন্তকে মর্তে নবরূপে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিলেন। পুষ্পদন্তের বন্ধু মাল্যবান দেবীর কাছে তাঁর হয়ে অনুরোধ করলেন। তিনিও সমান অভিশাপে গ্রস্থ হলেন। তখন পুষ্পদন্ত, মাল্যবান এবং জয়া দেবীর কাছে কাতরভাবে মিনতি করলে দেবী তাঁদের জানালেন ঃ বিন্ধ্যারণ্যে বাস করছে কানভূমি, যিনি পূর্বজন্মে ছিলেন সুপ্রতীক নামের যক্ষ, কুবেরের অভিশাপে পিশাচ হয়েছে। শিবের থেকে শোনা কাহিনিটি জাতিস্মর পুষ্পদন্ত সুপ্রতীক তথা কানভূতিকে শোনালেই স্বয়ং মুক্তি পাবেন কানভূতি। অন্যদিকে, কানভূতির কাছে থেকে শোনা কাহিনিটি জগৎ সমক্ষে প্রচার করলে মাল্যবানের মুক্তি ঘটবে। অভিশাপগ্রস্ত পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান মর্ত্যে এসে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে কৌশাম্বী নগরের বররুচি তথা কাত্যায়ন এবং সুপ্রতিষ্ঠিতা নগরের গুণাঢ্য।

কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলিতে এ দেশীয় কথনরীতিটি যেন সম্পূর্ণত অনুসৃত হয়েছে। সমগ্র রচনার মধ্যে রয়েছে অখণ্ডতা, কিন্তু সেই অখণ্ড রচনাটিই যেন অনেক খণ্ড খণ্ড কাহিনির সমবায়ে গড়ে উঠেছে। গল্পগুলি যেন বলা হয়েছে বৈঠকী ঢং -এ যেন কোন চণ্ডীকণ্ডপে সকলের সামনে কোন বক্তা তার শ্রোতাদের এই কাহিনি শুনিয়েছেন আবার একটি কাহিনি বলতে বলতে চলে এসেছে আর একটি কাহিনি, আবার সেই কাহিনিটি বলতে বলতে আবারও আর একটি কাহিনি চলে এসেছে। **এদেশীয় কাহিনির রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য কাহিনির রীতির পার্থক্য হল কাহিনির আদি - মধ্য অন্ত বিন্যাসের দিকটি।** এ দেশীয় কাহিনীরীতিতে আদি - মধ্য অন্ত্য এই সুস্পষ্ট বিন্যাসরীতিটি অনুপস্থিত। বররুচি ওরফে কাত্যায়ন যখন বিন্ধ্যারণ্যের দুর্গম পথে কানভূতির মুখোমুখি হলেন, তখন তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ল। এই বিষয়টিকে একটি কাহিনির আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। আবার কানভূতির কাছে বররুচি তাঁর নিজের জীবনের কথা বললেন। এই বিষয়টিকেও অন্য একটি কাহিনি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। আবার সেখান থেকে মর্ত্যে জন্মলাভ অবধি যাবতীয় ঘটনার বিবরণ শুনতে চেয়েছেন কানভূতি আর সে ঘটনা বলেও গেছেন বররুচি। তাই প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বররুচির দুই সতীর্থ ব্যাড়ি ও ইন্দ্র দত্তের কথা এসেছে তাঁর গুরু বর্ষের কথা। অর্থাৎ একটি গল্পের শেষ হতে না হতেই আর একটি গল্পের সূচনা হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পিঁয়াজ কিংবা আতা - কাঁঠাল জাতীয় ফলের গঠনের মতো। পিঁয়াজের ক্ষেত্রে যেমন একটি খোসা ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি খোসা এসে যায় এবং একের পর এক খোসা ছাড়াতে ছাড়াতেই পিঁয়াজ শেষ হয়ে যায়, কথাসারিৎসাগরের কাহিনিগুলিও যেন তেমনি সূত্রেই আবদ্ধ। তাই কথাসরিৎ সাগরের গঠনবিন্যাসের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্তই প্রয়োগ করা যায়।

কথাসরিৎসাগরের অখণ্ড কাহিনিটির স্বভাব বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের সমীপবর্তী বলে মনে হতে পারে আর এক খণ্ড খণ্ড কাহিনিগুলির গুণধর্ম ছোটগল্পের গুণধর্মের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। অজস্র আখ্যায়িকার সমবায়ে গড়ে ওঠা কথাসরিৎসাগরের কোন কোন আখ্যায়িকার গল্পরস রয়েছে। রূপিণিকার কাহিনিতে রূপিণিকা মথুরা নগরের রূপসী তরুণী, সে রূপজীবীও বটে। তার বৃদ্ধা মা মকরদংস্ট্রাও লৌহজঙ্ঘ নামের এক সুপুরুষ দরিদ্র সন্তানকে ভালবেসে ফেলে। যে নারী একদা সংসারের অগণন পুরুষের সঙ্গে কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় করেছে, সেই নারীই এই সুদর্শন পুরুষের স্পর্শে যথার্থ ভালবাসার জগতের শরিক হল। কিন্তু তার বৃদ্ধা মা মকরদংস্ট্রা তার মেয়েকে তাদের জীবিকার কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়, সে বলে তাদের কাজ হচ্ছে প্রেমের ছলাকলা করে ধনীর দুলালদের বশীভূত করা ও শোষণ করা। আর সে কি না তা না করে এক দরিদ্র পুরুষের সঙ্গে প্রেম করছে। কিন্তু রূপিণিকা সে কথায় কর্ণপাত করল না। তখন মকরদংস্ট্রা লৌহজঙ্ঘকে শায়েস্তা করতে ও বাড়ি থেকে তাড়াতে এক ধনী রাজপুত্রের শারণাপন্ন হল। সেই ধনী রাজপুত্র ও তার লোকজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান লৌহজঙ্ঘকে নিদারুণ প্রহার করল। সেই নির্মম দৈহিক আঘাতে লৌহজঙ্ঘ চৈতন্য হারাল আর তখন তারা তাকে পথের ধারের এক নোংরা গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু রূপিণিকা এ সংবাদ শোনার পর শোকে অতিশয় মুহ্যমান হল, রাজপুত্রও দেখল রূপিণিকাকে পাওয়ার আশা নেই। অন্যদিকে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর লৌহজঙ্ঘ অনুতাপে দগ্ধ হল এবং তীর্থে গিয়ে জীবন বিসর্জন দেবে— এমন মনস্থ করল। রূপিণিকার কাহিনির এ পর্যন্ত অংশটি বাস্তবসম্মত তাতে কোন সন্দেহই নেই। বাস্তবজীবনের উপাদান আহরণ করে ছোটগল্প গড়ে ওঠে, সুতরাং এ রচনাতেও রয়েছে গল্পের উপকরণ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর 'Peceuliar product' ছোটগল্পে বারবার প্রতিফলিত হয় আধুনিক জটিল জীবনের নানামাত্রিক ঘাতপ্রতিঘাত। কথাসরিৎসাগরের আখ্যায়িকাগুলিতে আগাগোড়া সে বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত সে সত্য স্বীকার করতেই হয়। রূপিণিকার আখ্যায়িকার পরবর্তী অংশটি তাই অলৌকিকতা অতিলৌকিকতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তাই দেখি, এরপর লৌহজঙ্ঘ নিদারুন কাতর ও প্রবল ক্ষুধাতৃষ্ণা জর্জরিত হয়ে এক মৃত হস্তীর ভিতরে প্রবেশ করে। সেই মৃত হস্তীর রক্তমাংস সব শিয়াল কুকুরে খেয়ে নিয়েছে, কেবল আছে তার কঙ্কাল ও ত্বকের আবরণ। লৌহজঙ্ঘ যখন সেই মৃত হস্তীর মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে, তখন এক মহাপ্লাবনে সেই হস্তীর মৃতদেহ নদীতে গিয়ে পড়ল, নদীর স্রোত সমুদ্রতীরে এল। লৌহজঙ্ঘও এসে পৌঁছল লঙ্কায়। সে রাজ্যের রাজা বিভীষণ তাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে নিজ ভূমিতে আহ্বান জানালেন। বিদায়কালে তিনি তাকে উপহার দিলেন একটি গরুড় জাতীয় পাখি যাতে চড়ে সে আকাশপথে যত্রতত্র ভ্রমণ করতে পারে। এছাড়া দিলেন বহু ধনরত্ন, শঙ্খ গদা ও পদ্ম। গরুড় পাখিতে চড়ে রূপিনিকার কাছে ফিরে এসে লৌহজঙ্ঘ নিজেকে বিষ্ণু বলে পরিচয় দিলেন। রূপিণিকাও নিজেকে বিষ্ণুর ভার্যা বলেই মনে করল। এ সমস্ত দৃশ্য দেখার পর চরম চতুর মকরদংস্ট্রা মেয়ে রূপিণিকার কাছে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করল এবং লৌহজঙ্ঘ যাতে তাকে স্বর্গে পৌঁছে দেয় সে জন্য রূপিণিকাকে তার কাছে অনুরোধ করার কথা পুনঃপুনঃ বলল। লৌহজঙ্ঘের আদেশে মকরদংট্রাকে কিমাকার চেহারায় পরিণত করা হল, তার মাথায় সমস্ত চুল কেটে ন্যাড়া করে শরীরের একদিকে কালিঝুলি মাখিয়ে দেওয়া হল। লৌহজঙ্ঘ মকরদংস্ট্রাকে আকাশপথে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরের একটি মন্দিরের সুউচ্চ চূড়ায় নামিয়ে রেখে দিল। সমবেত নগরবাসীরা সুউচ্চ চূড়ায় অবস্থিত একটি নারীকে দেখে প্রারম্ভে দেবী মনে করলেও পরবর্তীকালে তাদের ভ্রম ভেঙে গেল। মকরদংস্ট্রা উপযুক্ত শক্তি পেয়েছে, সুতরাং তাকে এই শাস্তি যে দিয়েছে তাকে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন— এমন মনে হল রাজার। রাজা লৌহজঙ্ঘের কাছে সমস্ত কিছু শুনলেন, তিনি পুরস্কার দিলেন তাকে। শুধু তাই নয়, রূপিণিকাকে তার বৃত্তি থেকে মুক্তি দিলেন তিনি।

মধুরায় লৌহজঙ্ঘ ও রূপিণিকা স্বামী - স্ত্রী হিসাবে সুখে - শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন।

কথাসরিৎ সাগরের এই আখ্যায়িকাটি কৌতুককর। পঞ্চতন্ত্র কিংবা হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় আখ্যায়িকার পরিণামের মতো এই আখ্যায়িকার পরিণামেও ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটি রয়েছে। গল্পে বাস্তবতাবর্জিত নানা ঘটনাকেও অঙ্কন করা হয়েছে। **আধুনিক ছোটগল্পের মতো সৃজ্যমান শিল্পকর্মে বাস্তবাতিরিক্ত জগতের চিত্রণ যে একেবারেই থাকে না তা নয়, তবে তা আসে কেবল রূপক হিসাবে নয়, প্রতীকায়িত ভাবে, সংকেতের সাহায্যে ও চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে।** উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় পার ল্যাগের্কভিস্টের 'দ্য লিফট দ্যাট ওয়েন্ট ডাউন ইন টু হেল' গল্পটির। প্রতিপত্তিশালী মিস্টার স্মিথের কাছে একটি নারী স্বামীর নিষেধ বারংবার আগ্রাহ্য করে রাত্রি কাটাবার জন্য এসেছে। সুরাবিলাশে মগ্ন স্মিথ ও নারীটি আরো আমোদ পাবার জন্য একটি লিফটে উঠল। লিফটের জনমানবহীন সংকীর্ণ স্থানে তারা দুজনে ঘনিষ্ঠও হল। কিন্তু লেখক দেখালেন 'দ্য লিফট ওয়েন্ট ডাউন; তা যেন উপরেই উঠে যায়, তা যেন আর নামছে না। এইভাবে তারা নরকের দুয়ারে এল, তারা দেখল—নরক অভিনব, এখানে কোন শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হয় না। একটি পৃথক ঘরে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল, তারা যখন মহানন্দে নিজেদের কামনা চরিতার্থ করতে প্রয়াসী, তখন তারা দেখল এক ছায়ামূর্তিকে, যে ছায়ামূর্তিতে আর কেউ দেখা দিলেন না, দেখা দিলেন নারীটিরই স্বামী। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর আচরণে মুহ্যমান স্বামী আত্মহত্যার পথই বেছে নিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাতে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হল নারীটি। বাস্তবাতিরিক্ত ঘটনার সমবায়ে গড়ে ওঠা ছোটগল্পটিতে প্রতীকায়িতভাবে আধুনিক জটিল জীবনকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'দ্য লিফট ওয়েন্ট ডাউন' অর্থাৎ দুটি নরনারী মনের দিক থেকে কতটা নিচে নামতে পারে তা-ই দেখালেন লেখক। আবার নরকের কোন দৈহিক যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হয় না—একথা উল্লেখের দ্বারা যেন আধুনিক মানুষের যন্ত্রণাকেই দ্যোতিত করা হল। দৈহিক যন্ত্রণা নয়, নারীটি ভোগ করছে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা—এই গভীরতর শোচনাও একালের মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে। অর্থাৎ কথাসরিৎসাগরের রূপিণিকার কাহিনিতে লৌহজঙ্ঘ গড়ুর পাখিতে চড়ে আকাশ পথে যায় এ কেবল ঘটনা মাত্র, বাস্তব জগতের সঙ্গে এ ঘটনার সংস্রব নেই, কোন প্রতীকায়িত তাৎপর্যের কারণেও এঘটনা উপস্থাপিত হয়নি। কিন্তু লাগের্কভিস্টের ছোটগল্পটিতে দুই নরনারীর লিফটে চড়ার ঘটনাটির প্রতীকায়িত তাৎপর্য অপরিসীম। এইভাবেই প্রমাণ করা যায় যে, কথা সরিৎসাগরে গল্প অংশ থাকলেও তা আধুনিক ছোটগল্প থেকে নানা দিক দিয়ে পৃথক হয়ে যায়।

তাম্রলিপ্ত নগরের এক বণিক ছিলেন ধনদত্ত, তাঁর সন্তানের নাম গুহসেন। বিবাহযোগ্য হলে গুহসেন ধর্মগুপ্তের কন্যা দেবস্মিতাকে বিবাহ করলেন। বণিক গুহসেন বহির্দেশে বাণিজ্য করতে চান, কিন্তু স্ত্রী দেবস্মিতা তাকে যেতে দিতে চান না। শেষপর্যন্ত শিব ঠাকুরের কাছে হত্যে দিলে শিবঠাকুর তাদের দুজনের হাতে দুটি রক্তকমল দিয়ে বললেন, যদি রক্তকমল দুটির পরিবর্তন না হয় তাহলে তারা বিচ্ছিন্ন থেকেও অবিশ্বস্ত হবে না, কিন্তু ম্লান হলেই তারা অপর কারও প্রতি আসক্ত হবে অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস - ভঙ্গ করবে। গুহসেন বাণিজ্যে গেলে কটাহ দ্বীপে তারই সমবয়সী চার বণিকপুত্রের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। সেই দুর্বৃত্ত মানুষগুলি গুহসেনকে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়ে রক্তকমলের যাবতীয় রহস্য জেনে নিল। তারপর সেই লম্পট মানুষগুলি তাম্রলিপ্তে এসে গুহসেনের অবর্তমানে তার স্ত্রীকে পেতে এক ভিক্ষুণীর শরণাপন্ন হল। সেই ভিক্ষুণী সিদ্ধিকরীর সঙ্গে দেবস্মিতার বাড়ি গেল এবং তাকে নানা প্রলোভনে ভোলাবার চেষ্টা করল। পরের দিনও যখন ভিক্ষুণী তার বাড়ি এল তখন বুদ্ধিমতী দেবস্মিতা এর কারণ উপলব্ধি করতে পারল। ভিক্ষুণী যখন চার বণিকপুত্রের আগমন সংবাদ দেবস্মিতাকে দিল এবং তাকে কুপ্রস্তাব দিল বিদুষী নারী সেই প্রস্তাবে সম্মত আছে এমন ভাব করল। কিন্তু ভিক্ষুণী চলে গেলে দেবস্মিতা তার বিশ্বস্ত দাসীকে ডেকে তার কাছে এই সমস্ত ঘটনাগুলি বলল এবং তাকে মদ, ধুতরো, লোহার কুকুরের পা প্রভৃতি আনতে বলল। একের পর এক বণিকপুত্র এসে দাসী দেবস্মিতার বেশে দুর্বৃত্তদের ধুতরো মেশানো কড়া মদ খাওয়ালে, তাদের আভরণহীন করল এবং আবরণও খুলে ফেলে লৌহনির্মিত কুকুরের পা উত্তপ্ত ক'রে কপালে দেগে নোংরা গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। নিজেদের দুর্দশার কথা কাউকে প্রকাশ না ক'রে দুবৃত্তরা নিজ স্থানে ফিরে গেল। এই দুর্বৃত্তরা তার স্বামীর ক্ষতি করতে পারে, তার প্রাণনাশ করতে পারে— এই ভাবনায় অস্থির হল দেবস্মিতা। কিন্তু তার মনে ছিল শক্তিমতীর কাহিনি, যে তার স্বামীকে বুদ্ধির দ্বারা উদ্ধার করেছিল। শক্তিমতীর কাহিনি দেবস্মিতা তার শাশুড়ীকেও বলল এবং তাকে চিন্তা করতে নিষেধ করল। দেবস্মিতা পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে কয়েকজন দাসীকে নিয়ে স্বামীর কাছে এল। কটাই দ্বীপে স্বামী গুহসেন নিরাপদে বাস করছে দেখে নিশ্চিন্ত হল। তখন দেবস্মিতা সেখানে রাজার কাছে বলল যে, চারজন তরুণ দুর্বৃত্ত চরম অপরাধ করেছেন এবং তিনি যেন দয়াবশত সকল তরুণকে হাজির করেন, কারণ তাহলেই প্রকৃত দুর্বৃত্তকে শনাক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। রাজার আদেশে রাজ্যের সকল তরুণ উপস্থিত হলে প্রকৃত দুর্বৃত্তকে চিনিয়ে দিল দেবস্মিতা। কিন্তু রাজকর্মচারী ও রাজ্যের অপরাপর জনগণ সেই চার তরুণকে দুর্বৃত্ত মেনে নিতে চাইল না। তখন দেবস্মিতা তাকে কপালে দেগে দেওয়া লৌহদণ্ডের ছাপ দেখাল, প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করল। অবশেষে সেই দূর্বত্তদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিলেন রাজা। দেবস্মিতার গুণে সকলে মুগ্ধ হলেন, রাজা তাকে মূল্যবান ধনরত্ন উপহার দিলেন এবং তা নিয়ে দেবস্মিতা তার স্বামীর সঙ্গে তাম্রলিপ্তে ফিরে এলেন।

কথাসরিৎসাগরের কাহিনিতে কোন কোন সময় জীবনের জটিলতার কিছু স্পর্শ থাকলেও এর মধ্যে আধুনিক ছোটগল্পে প্রতিফলিত জীবনের যন্ত্রণাদগ্ধ রূপ অনুপস্থিত। বরং জীবনের জটিলতা যেন কৌতুককর ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করার ফলে লঘু হয়ে যায়। তাছাড়া সর্বত্রই ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটি থাকে প্রাচীন কাহিনির মধ্যে। যাবতীয় জটিলতার অবসান ঘটে, রাজপুত্র - রাজকন্যার মিলন ঘটে, শত বাধা দূরীভূত হয়, সুখে - স্বাচ্ছন্দ্যে তারা ঘরকন্না করে। আধুনিক ছোটগল্পে এই সমগ্র ও সম্পূর্ণ স্বপ্নের জীবনকে দেখা যায় না, স্বপ্নভঙ্গের খণ্ডিত কাহিনিকেই নানাভাবে পাওয়া যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যায়, কথাসরিৎসাগরের নানা আখ্যায়িকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনোভঙ্গিটি বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত। নারীর সতীত্ব, পাতিব্রত্যের নানা প্রসঙ্গ এখানে উপস্থাপিত। বারংবার এমন কথাই বলা হয়েছে ও ভাবে - ভঙ্গিতে দেখানো যে, সতী - সাব্বী নারীরা তার স্বামীকে পরম দেবতারূপে ভজনা করে। সুতরাং নীতিধর্মিতার সংযোজনে কথাসরিৎসাগরের আখ্যায়িকাগুলির শিল্পমূল্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে আর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আধুনিক ছোটগল্পে শিল্পরূপটিকেই বিশেষভাবে মূল্য দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক নবজাত সংরূপ ছোটগল্প। ছোটগল্প কথাসাহিত্যের অন্তর্গত। সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' শব্দটি 'কথা' অর্থেই প্রয়োগ করা হত। যেহেতু গল্প বলা ও শোনার প্রবণতা প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মধ্যে ছিল আর তাই সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'কথা' শব্দটির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বুধস্বামীর 'বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহ' ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কথা' শব্দটি যেমন প্রযোগ করা হত, তেমনি 'কথম্' 'কথাকোবিদ' প্রভৃতি শব্দও যে ব্যবহৃত হত তার প্রমাণও পাওয়া যায়। বক্তা গল্প বলে যেতেন, শ্রোতা তা শুনতেন। আর তাঁর মনে ঐই ঔৎসুক্য জেগে উঠত যে কেমন করে সে ঘটনা ঘটল। শ্রোতা কৌতুহলী হয়ে তা জিজ্ঞাসাও করতেন। আবার সেই কেমন করে ঘটনা ঘটল তার বিবরণ অর্থাৎ শ্রোতার প্রশ্নের জবাব দিতেন বক্তা আর তাতেই গড়ে উঠত 'কথা।' মহাভারতে রাজা জনমেজয়কে তার

অতীত পুরুষদের কাহিনি শুনিয়েছেন ঋষি বৈশম্পায়ন। শ্রোতা জনমেজয়ের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কথক বৈশম্পায়ন। এই ভাবেই মহাভারতের কথা গড়ে উঠেছে। কথাসরিৎসাগরের মতো গ্রন্থের কথাও গড়ে উঠে শ্রোতার কৌতূহল মেটানোর মধ্য দিয়ে। কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' কাব্যে 'উদয়ন কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধ' -দের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ প্রাচীনকালে শ্রোতার কৌতূহল নিবারণ করতে গিয়ে বক্তা যা বলতেন তাই 'কথা' - রূপে পরিচিত ছিল আর অভিজ্ঞ বক্তাদের কথাকোবিদও বলা হয়। সুতরাং 'কথা' সম্পর্কে তাঁদের স্বকীয় মতামতকে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু উপন্যাস ছোটগল্পের মতো কথাসাহিত্যের এই যুগপৎ সৃজিত ও সৃজ্যমান ঘটনাগুলি আধুনিক কালের অভিনব সৃষ্টি। সংস্কৃতে সাহিত্যে অধিকাংশ গ্রন্থই কাব্যাকারে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত কথাগ্রন্থগুলি (যেমন কাদম্বরী-দশকুমার চরিতের মতো গ্রন্থগুলি) রচিত হয়েছিল সেগুলি আখ্যায়িকাজাতীয় ছিল। কিন্তু উপন্যাস - ছোটগল্পের মতো রচনাগুলি কেবলমাত্র আখ্যায়িকাজাতীয় নয়, এই রচনাগুলি গদ্যায়ত হলে ও বর্ণনাও সংলাপের মিশ্রণে রচিত। এই রচনাগুলির মধ্যে নাটক ও আখ্যায়িকার যুগপৎ গুণই নিহিত। তাই দেখা যায়, পাশ্চাত্যেও উপন্যাস ছোটগল্প প্রভৃতি আধুনিক সংরূপগুলি গড়ে ওঠার পূর্বকালে উপাখ্যান ও আখ্যায়িকার ধরণগুহি প্রচলিত ছিল এবং সেই সমস্ত আখ্যায়িকাগুলিতে বিখ্যাত রাজা অথবা প্রখ্যাত বীরপুরুষদের কার্যকলাপকে বিস্তৃতভাবে বলা হত।

অর্থাৎ 'কথাসাহিত্য' — এই শব্দটির অর্থ ব্যাপক —রূপকথা, উপ্যাখ্যান, নীতিগল্প, রোমান্স, নভেলেট প্রভতি সংরূপগুলি তার অন্তর্ভুক্ত। উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয় সংরূপই আধুমিক কালে, কিন্তু ছোটগল্প উপন্যাস অপেক্ষা সাম্প্রতিক কালের শিল্পরূপ। উনিশ শতকে ছোটগল্পের জন্ম, সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পরূপের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। আধুনিক কাল সমগ্র, সরল ও সম্পূর্ণ নয় সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের কালের সঙ্গে একালের নানামাত্রিক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিককালে থাকে নানা জটিলতা ও ঘাত প্রতিঘাত। সুতরাং, এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনিরূপেও সেই জটিলতা ও ঘাতপ্রতিঘাত অনুপস্থিত থাকে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথা বলতেই হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিষয়বস্তু নিয়েও আধুনিককালে ছোটগল্প লেখা হতে পারে। তবে, প্রাচীন কাহিনির মতো অবশ্যই তা সরল জটিলতাহীন ও একমাত্রিক কাহিনির তথা আখ্যায়িকার রূপে নয়, সেই রূপে থাকে শিল্পরীতি ও দৃষ্টিকোণের নানা পার্থক্য।

আমরা ইতঃপূর্বেই পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ কথা সরিৎসাগর জাতীয় রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, উক্ত রচনাগুলিতে কিংবা পৃথিবীর নানা দেশের আখ্যায়িকাগুলিতে, তা সে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে দেশই হোক না কেন, সেই আখ্যায়িকাগুলিতে গল্পের বীজ কিংবা উপকরণ ছিল। কিন্তু সেই রচনাগুলিতে আদুনিক কথাশিল্পের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য নেই, তাতে নেই সংলাপের তীক্ষ্নভেদ রূপ, নেই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের নানা মাত্রিক দিক, নেই একালের লেখকের জীবন চিন্তা ও চেতনা। যেমন রূপকার কথকের কল্পনা স্পর্শ করে এক উত্তুঙ্গসীমাকে তাতে রাজা, সেনাপতি, সওদাগর, কোটাল, রাজপুত্র, রাজকন্যা, সেনাপতিপুত্র, সওদাগরপুত্র, কোটালপুত্র প্রভৃতি শ্রেণি চরিত্র থাকে। রূপকথায় ব্যক্তিচরিত্রের জটিলতার নানারূপ থাকে না। আসলে, রূপকথা যে সময়ে সৃষ্ট সেই সম্পূর্ণতা ও সমগ্রতার কালে ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। বাহ্যিক জীবনের অযুত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজ শরীরকে বাঁচিয়ে রাজপুত্র আর এক রাজপুরীতে উপনীত হচ্ছে। সেখানে রয়েছে অসংখ্য উপদ্রব, তবুও সব উপদ্রব সে নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়ে নিজেকে রক্ষা করে ঘুমন্ত রাজকন্যার কাছে পৌঁচাচ্ছে। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে সে জাগাচ্ছে আবার তার কল্যাণেই সে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করছে এবং রাজকন্যাকে নিয়ে নিজ রাজপুরীতে ফিরে আসছে ও রাজা হিসাবে অভিষেক নিচ্ছে। রূপকথায় অজস্র প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে মানুষ লক্ষ্যে উপনীত হয়, কখনোই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না।

রূপকথার এই জাতীয় গল্পের সঙ্গে আধুনিক ছোটগল্পের পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায় তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা। এই প্রসঙ্গে ও হেনরির 'দ্য ফার্নিসড রুম' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই গল্পের একটি যুবক কোন রূপকথার রাজ্যে এসে পৌঁছয় নি, এসেছে নিম্ন 'ওয়েস্ট সাইড' -এর ভবঘুরে এলাকায়। এই এলাকায় যাযাবর মানুষগুলি একটি সজ্জিত ঘর থেকে আর একটি সজ্জিত ঘরে যায় এইভাবেই চিরদিন এক একটি ঘরে ক্ষণিকের অতিথি হিসাবে থেকে যায়। যুবকটি বারো নম্বর বাড়িতে এসে ঘন্টা বাজালে পরিচারিকা তাকে শ্যাওলা ধরা, পরগাছা জমা, রোদহীন সিঁড়ি বেয়ে নিয়ে যায় একটি সুসজ্জিত ঘরে, সেই ঘরে কোন রূপকথার রাজকন্যা নেই। আসলে, যুবকটি কয়েকমাস ধরে খুঁজে চলেছিল তার হারানো প্রেমিকাকে। এর আগে এই কয়েক মাস ধরে সে দিনের বেলায় ম্যানেজার, কোরাসের দল, এজেন্ট— সকলের কাছে তার খোঁজ করত আর রাতের বেলায় রঙ্গমঞ্চের শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করে অনুসন্ধান করতে চাইত। সুসজ্জিত ঘরে পৌঁছে যাবাবরী অতিথিদের রেখে যাওয়া প্রতিটি চিহ্নই যুবকটির কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই ঘরে চেয়ারে বসে থাকা যুবকটির কানে নানা শব্দ এসে পৌঁছল, তার নাকে এসে পৌঁছল বিভিন্ন গন্ধও। বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে সে স্যাঁতসেঁতে একটি গন্ধ পেল, গন্ধ পেল পচা কাঠের, কিন্তু একই সঙ্গে সে পেল মাইলোনেট ফুলের জোরালো মিষ্টি গন্ধও। এ গন্ধ তার পরিচিত গন্ধ, কেননা তার প্রেমিকা এই সুগন্ধই ব্যবহার করত। সে নিশ্চিত হল যে তার প্রেমিকা এই ঘরেই এসেছিল। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে পরিচারিকাকে সেই ঘরে এর আগে কে কে ছিল বারবার জানতে চাইল। কিন্তু সে তার জিজ্ঞাসার উত্তরে যা পেল, তাতে প্রেমিকা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না। তখন সে বন্ধ ঘরে গ্যাস জ্বেলে আত্মহত্যা করল। অর্থাৎ আধুনিক কুশীলব প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, কিন্তু রূপকথার রাজপুত্রের মতো অতি সহজেই সে বাধা অপসৃত করতে পারে না। পায় না রাজকন্যার দেখাও। রূপকথার জগৎ আসলে এ কালের মানুষের কাছে স্বপ্নের জগৎ, সে জগৎ এ বাস্তবে প্রতিনিয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে। আধুনিক ছোটগল্পকাররা সেই স্বপ্নভঙ্গের চিত্রকেই উপস্থাপিত করেন। তাই দেখি, 'দ্যা ফার্নিসড রুম' গল্পের পাঠকেরা জানতে পারে আর একটি আত্মহত্যার কথা। মিসেস ম্যাককুল আর মিসেস পার্ডির কথোপকথনের মাধ্যমে এই সত্যটি উঠে আসে, যে, ঐ ঘরে এর আগে একটি মেয়েও গ্যাস জ্বেলে আত্মহত্যা করেছিল। আধুমিক ছোটগল্পের এই অপরিসীম ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতগর্ভ উপস্থাপনা তথা চমক রূপকথার গল্পে নেই। এ যুগে রাজপুত্র সুপ্ত রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজপুরীতে নিয়ে যেতে পারে না। যুবকটির মতো একইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে যুবতীটিও। এই অনিবার্য সত্য এ কালের ছোটগল্পের বিষয় হয়ে ওঠে, পাঠকও তার নিজ স্থান - কালের সত্য অনুধাবন করে সে গল্প পাঠের দ্বারা।

পঞ্চতন্ত্র - হিতোপদেশ ঈশপের ফেবল জাতীয় নীতিকথামূলক গল্পগুলিতে সচরাচর একটি কাহিনির সমান্তরালে আর একটি কাহিনিকে পরিবেশন করা হয়, অর্থাৎ এই জাতীয় রচনাগুলিতে থাকে রূপকের আবরণ। নীতিকথামূলক গল্পগুলিতে আপাতভাবে উদ্ভট কল্পনা থাকে। সিংহ সেখানে রাজা হয়, শিয়াল হয় অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির, হরিণ - বাঘ - খরগোশ - হাতি প্রভৃতি বন্য জন্তুরা সেখানে প্রজা মাত্র। নীতিকথায় রচনাকালের বক্তব্য গল্পকাহিনিকে অতিক্রম করে প্রকাশিত হয়। আধুনিক গল্পকারের জীবনের প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা— দুটি দিককেই দেখান, তার জটিল বিন্যাসকে উপস্থাপিত করেন, প্রতিনিয়ত মানুষের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াকেও সেখানে প্রদর্শন করেন। আধুনিক ছোটগল্পকারেরা তাই নীতিকথার তথা আখ্যায়িকা রচনাকারের মতো কখনোই নীতিবাক্য বলেন না।

আসলে উপন্যাস - ছোটগল্পের মতো কথা - সাহিত্যের আধুনিক সংরূপগুলি উদ্ভবের মূলে সমাজব্যবস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা আছে। উপন্যাস উদ্ভূত হয় এক দ্বন্দ্বময় সমাজ ব্যবস্থায়, যে সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, সমাজের সঙ্গে সমাজের, কিংবা ব্যক্তির অভ্যন্তরের বিভিন্ন সত্তার মধ্যে নানামাত্রিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাস যে সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভূত তারই একটি বিশেষ পর্বে ছোটগল্পেরও জন্ম হয়। সমাজের জটিলতার চরম স্তরে, এক যন্ত্রণাদগ্ধ কালে, ব্যক্তি আত্মার চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের কালে ছোটগল্পেরও উদ্ভব ঘটে। তাই ছোটগল্পে থাকে ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা। তার নানামাত্রিক চেতনা তথা বীক্ষার প্রসঙ্গ; তার নানা পতনের চিত্র, যন্ত্রণার ছবি। কথা সরিৎসাগরের গল্পে, পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিতে, মধ্যযুগীয় রোমান্সে কিংবা আরব্যরজনীতে যন্ত্রণার ও দহনের কথা নেই, ব্যক্তির অনুভবের কথা সেখানে অনুপস্থিত এই সমস্ত গ্রন্থ আসলে ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, সমাজের সৃষ্টি। মানুষ চিরকালই নিজ কৌতূহলকে মেটানোর প্রয়োজনে গল্প বলেছে, গল্প শুনেছে, গল্প তৈরি করেছে। সে গল্প একজনের কাছে থেকে আর একজনের কাছে পৌঁছেছে। আবার এই গল্পগুলিকে পরবর্তীকালের কোন সাহিত্যিক সঙ্কলনও করেছেন। সুতরাং এই সমস্ত কাহিনিগুলি সেই সঙ্কলন ভুক্ত মাত্র, তাতে তাই সমাজের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগে সৃষ্ট সাহিত্যগুলি আখানধর্মী হলেও এবং তা কোন ব্যক্তির সৃষ্ট হলেও তা আসলে সমাজ - প্রচলিত শ্রুতিনির্ভর সাহিত্যেরই রকমফের মাত্র। সেখানে থাকে কল্পনার অতিরঞ্জন, বাস্তবের চিত্রণ সেখানে থাকে না বললেই চলে। মধ্যযুগের রোমান্সজাতীয় রচনাগুলিতে যে সমস্ত কাহিনি নির্মিত হয়েছে, তার বিষয়বস্তু বড় গতানুগতিক, শ্রুতিনির্ভর রূপকথার মতোই যুদ্ধ ও প্রেমকে অবলম্বন করে তা রচিত। এক-একজন কাহিনিকার নতুন - নতুনভাবে ঘটনাধারার নানা বৈচিত্র্য এনে কাহিনিকে পরিবেশন করেন, কিন্তু সে কাহিনির সঙ্গে একালের ঘাত প্রতিঘাতময় জটিল জীবনের সংস্রব বড় কম। সমাজের একমাত্রিক চিত্রণই সেখানে দেখা যায় চরিত্রের গড়ে ওঠের ব্যাপারটি সেখানেই নেই, তার being থেকে becoming-এর দিকে যাওয়া নেই অর্থাৎ বিবর্তন নেই, তার মনোজগতের তীব্র আলোড়ন নেই। আবার ছোগল্পের মধ্যে যে symetry of design থাকে, বিন্যাসের ঐক্য ও সংহতি থাকে Moment of Crisis থাকে, সুনির্দিষ্ট ক্লাইম্যাক্স থাকে, কিংবা শুরু ও সমাপ্তির শিল্পরূপ থাকে, তীব্র নাটকীয়তা থাকে— মধ্যযুগের এলায়িত - অতিরঞ্জনমূলক আখ্যানে সে সব অনুপস্থিত থাকে তা বলাই বাহুল্য। আবার প্রাচীন ও মধ্যযুগের আখ্যানগুলিতে দেববাদের মহিমার কথা নানাভাবে বলা হয়েছে, সেখানে কাহিনি রচিত হয়েছে ধর্মীয় একটি ভিত্তিকে অবলম্বন করে। ছোটগল্প কোন ধর্মের মহিমার কথা নয় মানুষের কথা, বিশেষভাবে ব্যক্তিমানুষের কথা বলে, তার অভিজ্ঞতার - যন্ত্রণার দহনের কথাই শোনায়।

অন্যদিকে, আধুনিক কালের নভেলেট জাতীয় রচনার সঙ্গে ছোটগল্প সংরূপটির শিল্পগত দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্য বড় প্রবল। নভেলেট উপন্যাসের চেয়ে কলেবরগত দিক দিয়ে ক্ষুদ্র মাত্র; কিন্তু তার সঙ্গে উপন্যাসের প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ নেই। উপন্যাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন কাহিনির ক্রমবিবর্তিত রূপমাত্র নয়। বিশেষ কোন প্রেক্ষাপটে স্থাপিত চরিত্রের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে মানবজীবনের দ্বন্দ্বমথিত রূপ প্রকাশিত হয়। সেখানে অবলম্বন করা হয় সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষণবিন্দুও। বিশেষ দেশ ও কালে অবস্থিত লেখকের জীবনবিষয়ক বক্তব্যও সেখানে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে থাকে ঘটনার নানা বিস্তার, তাতে থাকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। জীবনের নানা রূপকে ক্রমান্বয়ে এবং অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হয়ে সেখানে উদ্ঘাটিত করা হয়। সেখানে পটভূমিরও থাকে অযুত বিস্তার। বিশেষ গল্পে , যেখানে পটভূমির এই বিস্তার থাকে না সেখানে আভাসে - ইঙ্গিতে - ব্যঞ্জনায় নিহিতার্থে তা প্রকাশ করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক অবিরাম প্রবাহের একটি উজ্জ্বল লহমাকেই ছোটগল্পে উপজীব্য করা হয়। যে চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে ছোটগল্প গড়ে ওঠে তার জীবনের মাঝখানের ঘটনা দিয়েই ছোটগল্প শুরু হতে পারে, আবার তার জীবনের মাঝখানের ঘটনার ব্যঞ্জনাময় উপস্থাপনে ছোটগল্প শেষও হতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের শুরুতে থাকে অনুপুঙ্খতা, ঘটনা ও চরিত্রের ক্রমবিস্তার ও বিলম্বিত লয়; শেষে থাকে অসংখ্য চরিত্র ও বৃত্তের উপস্থাপনা।

উপন্যাসের কলেবর কেবল বিস্তৃত নয়, এর মধ্যে নানামাত্রিক উপাদানও সংমিশ্রিত থাকে। লেখকের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বয়ন থাকে এই সংরূপটিতে। স্বভাবতই তার বৃত্ত গঠন সরল ও একমাত্রিক হয় না, তা হয় জটিল ও বহুমাত্রিক। উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে তাই অসংখ্য উপকাহিনিও থাকে। সেই উপকাহিনিগুলি মূল কাহিনির সমান্তরালে অথবা বৈপরীত্যে গড়ে উঠে মূল কাহিনিকে আলোকিত করে। কখনো বা সেগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ বা অসামাঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে উঠে উপনাসকে বহুমাত্রিক করে তোলে। অসংখ্য চরিত্রও তেমনি তাদের নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে, উপন্যাসের জগতে স্বাধীনভাবে চলা - ফেরা করে উপন্যাসটিকে বহুস্বরিক করে তুলতে পারে। ছোটগল্পে থাকে Single impression তাতে থাকে Single character, Single incident এবং Single effcet।

উপন্যাসের কলেবর যে ছোটগল্প অপেক্ষা বৃহৎ হয় তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যায়, নানা উপন্যাসের মধ্যে ওই কলেবরগত প্রবল তারতম্যও দেখা যায়। দস্তয়েভস্কির ক্রাইম অ্যান্ড পানিসমেন্ট, টলস্টয়ের ওয়ার অ্যান্ড পিস, রবীন্দ্রনাথের গোরা, তারাশঙ্করের কীর্তিহাটের কড়চা, কিংবা দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ বৃহদায়তন উপন্যাস। আবার রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, আলব্যের কামুর আউটসাইডার, সমরেশ বসুর বিবর কিংবা গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের নিদয়া ঠাকুমার কাহিনি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস। আসলে, এ সম্পর্কেও কোনও নির্দিষ্ট বিধান কেউ দিতে পারে না। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'মেঘ ও রৌদ্র', 'মাস্টার মশাই' কিংবা 'রাসমণির ছেলে' ছোটগল্পের সঙ্গে তারই অনধিকার প্রবেশ, 'পোস্টমাস্টার' অতিথি' প্রভৃতি ছোটগল্পের কলেবরগত পার্থক্যকে চেকভের 'দ্য স্তেইপ; 'মাই লাইফ' প্রভৃতি গল্পের সঙ্গে ও হেনরির 'দ্যা সিটি ডেডফুল নাইট' 'দ্য রোডস্ উউটেক' বা 'এ স্যাক্রিফাইস' হিট' প্রভৃতি ছোটগল্পের আয়তনগত পার্থক্যকে। আসলে, উপন্যাসে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রাচুর্য থাকে। সেখানে ঘটনার বিকাশ ঘটার প্রাকমুহূর্তটিও বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট হতে পারে, বেশ খানিকটা কলেবর জুড়ে তার প্রকাশ ঘটতে পারে। ছোটগল্প একটি চরিত্রের কোন ভাবনার আলোকে, একক ঘটনার কোন চমকিত প্রকাশের কিংবা উপসংহারের তীব্র ব্যঞ্জনাময় উদঘাটনে জীবনের কোন গভীরতর দিককে উদ্ভাসিত করে। অর্থাৎ উপন্যাসে থাকে বর্ণনার প্রাধান্য, ছোটগল্পে থাকে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য। এখানেই উপন্যাস অপেক্ষা কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের প্রকৃতিগত সাযুজ্য অধিক। কবিতার মতোই ছোটগল্পের গতি দ্রুত। এখানেই উপন্যাস অপেক্ষা একাঙ্ক নাটকের সঙ্গে ছোটগল্পের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বেশি। বাস্তবপক্ষে, উপন্যাস সমগ্রজীবনের কথা বলে, ছোটগল্প বলে খণ্ডিত লহমার অনুভবের কথা, যদিও দুটি সংরূপই জীবনকে প্রকাশ করে আর সে প্রকাশ গদ্যায়ত।